সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৫৯ ॥ সংখ্যা ১-২ ॥ ফাল্গুন ১৪৩০ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Vol. 59 | No. 1-2 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত সূক্তিতে সমাজ

Volume	59
Issue	1-2
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Titash Kumar Sil
Published online	December 31, 2024
DOI	10.62328/sp.v59i1-2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i1-2.3
Pages	55-74
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.3
প্রবন্ধ জমাদান: ২০ জানুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ৫৫-৭৪

সংস্কৃত সূক্তিতে সমাজ

তিতাস কুমার শীল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: titasdu06@gmail.com

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে সংস্কৃত ভাষা একটি। এ ভাষায় রচিত কাব্য, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, ধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল দিক আলোচিত হয়েছে। বিশাল এ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর সূক্তি রয়েছে। এগুলো প্রাচীন ভারতের মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলিত রূপ। সমাজে মানুষের সুখ-দুঃখের বিভিন্ন কথা, লোকনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির বিভিন্ন তথ্য মেলে এসব সুভাষিতে। আলোচ্য প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কিছু গ্রন্থের কিছু সূক্তি আলোচিত হয়েছে এবং এ চমৎকার উক্তিগুলোর মাঝে তৎকালীন সমাজের কোন বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে এবং বর্তমান সমাজে তার প্রয়োজনীয়তা কী, তা আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

সংস্কৃত সাহিত্য, মানুষ, সুভাষিত, সমাজভাবনা, সমাজগঠন, মানবসভ্যতা, তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত মহাকাব্য। ঋষি বাল্মীকি এ মহাকাব্য রচনা করেছেন। *রামায়ণ* সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। রামচন্দ্রের জীবনকাহিনিই হলো *রামায়ণের* মূল উপজীব্য বিষয়। এ মহাকাব্যে আদর্শ স্বামী, আদর্শ ভাই, আদর্শ রাজা, আদর্শ স্ত্রী প্রভৃতি চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে আদর্শ মানবসমাজকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে *রামায়ণ* হয়ে উঠেছে একটি মানবিক কাব্য। এ গ্রন্থে রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভাইদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, পিতার সত্যরক্ষায় সিংহাসন ছেড়ে বনে গমন, রাম-সীতার প্রেম ও একে অপরের প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে *রামায়ণ* হয়ে উঠেছে আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। *রামায়ণ* সম্পর্কে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশ-জয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষমাত্র; পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। ... গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৯-১০)

রামায়ণে প্রচুর সুন্দর সুন্দর উক্তি রয়েছে যা সমাজের বিভিন্ন ঘটনাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। *রামায়ণে* বলা হয়েছে,

> ধৃতির্দৃষ্টিমতির্দাক্ষ্যং স কর্মসু ন সীদতি। সুন্দরকাণ্ড ১/২০১ (বাল্মীকি ১৯৯৬: ১৪)

অর্থাৎ, যাঁর মধ্যে ধৈর্য, সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা, বুদ্ধি ও দক্ষতা এ গুণগুলো আছে, তিনি কাজ করতে গিয়ে কখনো ব্যর্থ হন না।

একজন মানুষের সফলতার পেছনে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে। সহনশীলতা তার মধ্যে একটি। মানুষকে বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে জয় লাভ করতে হয়। ফলে মানুষের সহ্যগুণ থাকতে হয়, এ গুণ না থাকলে মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে ওঠে। আর মানুষ যখন ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে তখন কোনো কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ফলে সমাজের বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করা তার জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। যে মানুষ অস্থির, যে মানুষ কষ্ট সহিষ্ণু নয়, সে সবসময় পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে। তাই ধৈর্যহীন মানুষ বারবার ব্যর্থ হয়। দূরদর্শিতা সফল মানুষের অন্যতম গুণ। ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে এ বিষয়গুলো বুঝতে পেরে পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়াই হচ্ছে দূরদর্শিতা। ভবিষ্যতের ভাবনাই জ্ঞানী মানুষের কাজ। জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি সবসময় কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। তার ইচ্ছাকে সবসময় বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সভ্যতা অনেক দূর এগিয়ে যায়। জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকলে মানুষ সফলকাম হয় না। *পঞ্চতন্ত্রেও* তাই বলা হয়েছে,

> যস্য বুদ্ধির্বলং তস্য, নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্। মিত্রভেদ ২১৭ (বিষ্ণুশর্মা ২০১৪: ২৬৩)

অর্থাৎ, বুদ্ধি যার বল তার, নির্বুদ্ধির বল কোথায়?

বুদ্ধিমান মানুষ কৌশলের সাহায্যে তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সমাজের সফলকাম ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই ধৈর্য, দূরদর্শিতা, বুদ্ধি, দক্ষতা প্রভৃতি গুণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান। এসব গুণ মানুষকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে।

সমাজ পর্যালোচনায় আমরা দেখি সমাজের অযোগ্য মানুষেরা সবসময় নিজেদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। তারা সর্বত্র নিজের গুণগান করে বেড়ায়। বর্তমান সমাজে এ প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। কিন্তু গুণীজন সাধারণত কখনো এ কাজ করেন না। *রামায়ণে* আমরা পাই,

> ন মর্ষয়ন্তি চাত্মানং সম্ভাবয়িতুমাত্মনা।
> অদর্শয়িত্বা শূরাস্ত কর্ম কুর্বন্তি দুষ্করম্॥ যুদ্ধকাণ্ড ৬৫/৪ (বাল্মীকি ১৯৯৬: ৪০৯)

অর্থাৎ, বীরপুরুষরা কখনো অযথা নিজের প্রশংসা করেন না। তাঁরা বাক্য প্রকাশ না করেই দুষ্কর কাজ করে থাকেন।

এ উক্তিটি করেছিলেন মহাবীর কুম্ভকর্ণ। রামের সাথে যুদ্ধের পূর্বে বড় ভাই রাবণকে তিনি এ কথা বলেছিলেন। সমাজে দেখা যায় যাঁরা দক্ষ, কর্মঠ, জ্ঞানী পরিশ্রমী তাঁরা অযথা কথা বলেন না। তাঁরা সাধারণত মিতভাষী হয়ে থাকেন, তাঁদের আচরণ কখনো উদ্ধত হয় না। অন্যদিকে যারা অল্প জ্ঞানের অধিকারী তারা সাধারণত বাচাল প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা সবসময় আত্মপ্রশংসা করে থাকে, অপরের সামনে নিজেদের জাহির করতে সদা সচেষ্ট থাকে। তাদের হাঁক-ডাক, ঠাঁট-বাট, তর্জন-গর্জন একটু বেশি হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'খালি কলসি বাজে বেশি'। যে কলসি পানিতে পূর্ণ থাকে তার শব্দ তেমন হয় না। তেমনি যে ব্যক্তি জ্ঞানী, কৌশলী তাঁর অযথা কথার দাপট থাকে না। তাঁরা নীরবে, নিভৃতে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। ফলবান বৃক্ষের মতো মাথা নিচু করে মানুষকে ফল দিয়ে যান। ফলহীন বৃক্ষের মতো শুধু লম্বা হন না। তাঁদের মহৎ কাজের মাধ্যমে তাঁরা সমাজে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখেন, সমাজও তাঁদের চিরদিন স্মরণ রাখে। বর্তমান সমাজেও আমরা একই চিত্র দেখি। যারা অন্তঃসারশূন্য তারা নিজের গুণকীর্তন ও অন্যের সমালোচনায় বেশি ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের নিজের প্রশংসা নিজের করার দরকার হয় না, সমাজের অন্য মানুষেরা তাঁর প্রশংসা করে। তাঁরা শুধু ভিতরে ভিতরে সমাজের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করে যান। তাঁর প্রশংসা কেউ করলে বা না করলে তাঁর কিছু আসে যায় না। বিজ্ঞজনেরা এগুলো নিয়ে কখনো ভাবেন না।

সমাজের অধিকাংশ মানুষ দৈবে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে দৈব মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা। দৈবের কারণে সমাজে সবকিছু ঘটে থাকে। কিন্তু সমাজে কিছু যুক্তিবাদী মানুষ থাকেন, তাঁরা মনে করেন মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাণ করেন। *রামায়ণে* লক্ষ্মণের কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই,

> বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
> বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মনো ন দৈবং পর্যুপাসতে॥ অযোধ্যাকাণ্ড ২৩/১৬ (বাল্মীকি ১৯৯৬: ২৪৪)

অর্থাৎ, যারা বীর্যহীন, ক্লীব তারাই দৈবকে অনুসরণ করে। কিন্তু যাঁরা শৌর্যবীর্য ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন তাঁরা কখনো দৈবকে গ্রাহ্য করেন না।

সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় দৈব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দৈবের প্রভাব এতই ব্যাপক যে মানুষ সহজে অতিক্রম করতে পারে না। অনেক সময় কাজ কর্মের পদ্ধতি ঠিক থাকলেও সাফল্য ধরা দেয় না, ব্যর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে দৈবকেই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে ধরা হয়। বলা হয়ে থাকে মানুষের প্রত্যেকটি সাফল্যই নাকি দৈবের কারণে হয়। এমনকি চাণক্যের মতো বিখ্যাত কূটনীতিবীদ, যুক্তিবাদী মানুষও দৈব ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তিনি লিখেছেন,

> দৈবাৎ পরং বলম্। ৭৩ (চাণক্য ১৯৯০: ৭১)

অর্থাৎ, দৈবের সমান বল নেই।

বাংলা ভাষায়ও একটি প্রবাদ আছে ‘কপালের লিখন না যায় খণ্ডন’। অর্থাৎ কপালে যা আছে তা ঘটবেই। নিয়তিকে কেউ খণ্ডাতে পারে না। দৈবের কাছে মানুষ অসহায়। কিন্তু *রামায়ণে* এ দৈব বা নিয়তিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে রামের কাছে ক্রুদ্ধবাক্যে লক্ষ্মণ করেছিলেন এ বিপ্লবী উক্তি। প্রকৃতপক্ষে দুর্বল ব্যক্তিরাই দৈব মানে, সবলেরা নয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আজ বিশ্ব অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। পৃথিবী চলে এসেছে আমাদের হাতের মুঠোয়। বিজ্ঞান জীবনযাত্রাকে করেছে সহজ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে বেড়েছে আমাদের গড় আয়ু। এগুলো সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর কিছু মানুষের গবেষণা, উন্নত চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি, পরিশ্রম প্রভৃতির কারণে। ঐশ্বরিক কোনো কারণে এটা সম্ভব হয়নি। আজ বিজ্ঞানের যে নব নব আবিষ্কার, নতুন ফর্মুলা, নতুন নতুন ভাবনা এগুলো কোনোটি দৈবের কারণে হয়নি; হয়েছে যুক্তি, জ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা। *পঞ্চতন্ত্রে* বলা হয়েছে,

> উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী—
> দৈবং হি দৈবমিতি কাপুরুষা বদন্তি। মিত্রভেদ ৩৬৫ (বিষ্ণুশর্মা ২০১৪: ২৮১)

অর্থাৎ, উদ্যমী পুরুষরাই কেবল সম্পদশালী হতে পারেন, আর যারা অদৃষ্টের দোহাই দেয় তারা কাপুরুষ।

তাই সমাজে যারা যুক্তিহীন, অজ্ঞ, পরিশ্রমহীন, বীর্যহীন তারাই মূলত দৈবকে সত্য বলে মনে করে। কারণ তাদের নিজেদেরকে, সমাজকে পরিবর্তনের কোনো বুদ্ধি, যোগ্যতা নেই। নিজের অযোগ্যতাকে ঢেকে রাখতে তারা বেশির ভাগ সময় দৈবকে সামনে নিয়ে আসে এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা দৈবকে গ্রাহ্য করেন না।

পৃথিবীতে প্রধান যে কয়েকটি মহাকাব্য বিদ্যমান *মহাভারত* তার মধ্যে একটি। এ মহাকাব্যটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এ বিখ্যাত মহাকাব্যটি রচনা করেছেন। বেদব্যাস

মূলত ভরতবংশের ইতিহাস রচনা করেছেন, যার নাম *মহাভারত*। 'ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে' (আদিপর্ব ৫৬/৩১)। অর্থাৎ, ভরতবংশের মহনীয় চরিত্রকথাই *মহাভারত*। *মহাভারতে* ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দু ভাই। ধৃতরাষ্ট্র বড় এবং পাণ্ডু ছোট। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কৌরব এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব নামে পরিচিত। *মহাভারতে*র প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের মূল কারণ সিংহাসনের অধিকার। সিংহাসনের দখল নিয়েই ভয়ংকর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে কৌরব বংশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছিল। আঠারোটি পর্বে বিভক্ত *মহাভারত*। *মহাভারতে* সমাজের সকল বিষয় যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষের বিভিন্ন রকম চরিত্র, ধর্ম, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এজন্য *মহাভারত* সম্পর্কে বলা হয় 'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে'। অর্থাৎ, *মহাভারতে* যা নেই ভারতবর্ষে তা নেই। *মহাভারতে*র গুরুত্ব বোঝাতে *মহাভারতে*ই বলা হয়েছে, 'চত্বার একতো বেদা ভারতং চৈবমেকতঃ' (আদিপর্ব ১/২০৮)। অর্থাৎ, একদিকে চারটি বেদ আর অন্য দিকে *মহাভারত*। অর্থাৎ, গ্রন্থ হিসেবে *বেদ* ও *মহাভারত* একই রকম। এ *মহাভারতে* প্রচুর সুভাষিত রয়েছে। এ সুভাষিতের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত হয়েছে। *মহাভারতে* বলা হয়েছে,

> অহিংসা সকলো ধর্ম্মো হিংসাধর্ম্মস্তথাহিতঃ। শান্তিপর্ব ২৬৬/২০ (বেদব্যাস ১৪২২: ২৭৩৪)

অর্থাৎ, হিংসা না করাই পরম ধর্ম, হিংসা করা অধর্ম এবং এটা অমঙ্গলজনক।

সমাজ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সমাজের মানুষ বিভিন্ন রকম হিংসা, বিদ্বেষে জর্জরিত। সমাজের মানুষের মধ্যে যখন লোভ, লালসা, অহংকার প্রভৃতির জন্ম নেয় তখন মানুষ হিংসায় মত্ত হয়ে ওঠে। হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে অন্ধ করে তোলে, মানুষের বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। আমরা আমাদের সমাজে দেখি ভাইয়ে-ভাইয়ে, পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক নষ্টের অন্যতম কারণ হিংসা। অন্য দিকে একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে অহিংসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের মানুষ যখন প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন সে সমাজ শান্তিপ্রিয় সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবধর্ম। এ মানবধর্ম প্রতিষ্ঠায় অহিংসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের মানুষ যখন আত্মজ্ঞানে অন্যকে দেখে তখন সুন্দর সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়। *মহাভারত*কে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থও বলা হয়। ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> অদত্তস্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ।
> অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্যা ধর্মস্য লক্ষণম্॥ শান্তিপর্ব ৩৬/১০ (বেদব্যাস ১৪২২: ৩৩৪)

অর্থাৎ, চুরি না করা, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা করা, হিংসা না করা, সত্য ব্যবহার ও অক্রোধ এগুলি ধর্মের লক্ষণ।

এখানে বলা হয়েছে হিংসা না করা ধর্মের অন্যতম লক্ষণ। আসলে অহিংসা প্রতিষ্ঠাতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা হয়। সর্বভূতে কল্যাণচিন্তা, মৈত্রীভাবনাই ধর্ম। পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম। অতএব সুন্দর সমাজ নির্মাণে অহিংসার চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে আসি মিথ্যা বলা মহাপাপ, কখনো মিথ্যা কথা বলবে না, সবসময় সত্য কথা বলবে। সমাজে দেখা যায় যাঁরা সত্য কথা বলেন তাঁদের সকলে পছন্দ করে, ভালোবাসে। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। মিথ্যাকে সকল পাপের জননী বলা হয়। একটি মিথ্যা থেকে নানা রকম পাপের সৃষ্টি হয়। মিথ্যা বলাকে সমাজে অশোভনীয় ও অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ হিসেবে ধরা হয়। *মহাভারতে*ও মিথ্যা বলাকে পাপ বলা হয়েছে। অন্যদিকে সত্য কথা বলাকে উত্তম বলা হয়েছে,

> সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্। কর্ণপর্ব ৫১/৩০ (বেদব্যাস ১৪২২: ৬৮৯)

অর্থাৎ, সত্য কথা বলা ভালো। কেননা সত্য কথা বলা থেকে ভালো কিছু নেই।

কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা উত্তম কাজ নয়, পাপ। নিজের বা অপরের কল্যাণের জন্য মিথ্যা কথা বললে কোনো পাপ হয় না। *মহাভারত* বলছে,

> ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
> যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ॥ কর্ণপর্ব ৫১/৩১ (বেদব্যাস ১৪২২: ৬৮৯)

অর্থাৎ, যেখানে মিথ্যা কথা বলা সত্য কথা বলার ন্যায় উপকারী অথবা সত্য বলাটা মিথ্যা বলার মতো অপকারী; সেখানে সত্য কথা বলবে না। মিথ্যা কথা বলবে।

প্রকৃতপক্ষে যেখানে সত্য বললে মানুষের ক্ষতি হয়, অকল্যাণ হয়, সেখানে সত্য বলা উচিত নয়, মিথ্যা বলাই উত্তম। *মহাভারতে* এ ব্যাপারে একটি উপাখ্যান আছে। এটি কৌশিকোপাখ্যান নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ এ উপাখ্যানটি অর্জুনের নিকট বলেন। কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ একবার প্রতিজ্ঞা করেন তিনি আর মিথ্যা বলবেন না। একবার এক দস্যুদল কয়েকজন পথিককে তাড়া করে। প্রাণভয়ে পথিকেরা ব্রাহ্মণের তপোবনের নিকটে লুকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে দস্যুরা কৌশিকের আশ্রমে এলে দস্যুদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তখন কৌশিক সত্য কথা বলা পুণ্য এ ভেবে পথিকদের দেখিয়ে দিলেন। তারপর দস্যুদল পথিকদের মেরে তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণের সত্য কথা বলার জন্য পথিকদের মৃত্যু হলো। এ সত্য বলার কারণে ব্রাহ্মণের পাপ হলো এবং পরবর্তী জন্মে তাঁকে নরকে গমন করতে হয় (কর্ণ পর্ব, ৫১ অধ্যায়)। তাই বলা যায়, আমাদের সবসময় সত্য বলা উচিত নয়। প্রয়োজনে মিথ্যা বলা উচিত। যে কথা বললে মানুষের উপকার হয়, কল্যাণ হয়, সেটাই বলা উচিত; সেটা হোক মিথ্যা কথা। এখানে মিথ্যা কথা বলাই ধর্ম।

সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোক বাস করে। কেউ খুবই ধনী কেউ বা দরিদ্র, কেউ জ্ঞানী, কেউ বা মূর্খ, কেউ ধার্মিক কেউ বা অধার্মিক। বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিয়েই সমাজ গঠিত হয়। আমরা প্রায়ই বলি সকল মানুষ সমান, সকল মানুষের সমান অধিকার। সকল মানুষ একে অপরের ভাই ভাই। কিন্তু এ তথ্য প্রকৃত পক্ষে সত্য নয়। সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য চিরকালই বিদ্যমান। সমাজে সাধারণত তারা কেউ কখনো কারো বন্ধু হয় না। *মহাভারতে*র আদিপর্বে আমরা দেখি দ্রুপদ ও দ্রোণ দুজনে ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন। পরে দ্রুপদ রাজা

হলে একদিন দ্রোণ রাজসভায় গিয়ে দ্রুপদকে সখা হিসেবে সম্বোধন করেন। তখন দ্রুপদ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সমাজের এক অতি বাস্তব কথা বলেন। তিনি বলেন,

> ন দরিদ্রো বসুমতো নাবিদ্বান্ বিদুষঃ সখা। আদিপর্ব ১২৭/৯ (বেদব্যাস ১৪২২: ১৩৯২)

অর্থাৎ, দরিদ্র কখনো ধনীর বন্ধু হয় না, মূর্খ কখনো পণ্ডিতের বন্ধু হয় না।

আমাদের সমাজ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি, ছেলেবেলায় একসাথে স্কুলে পড়েছে, ঘোরাঘুরি করেছে, খেলাধুলা করেছে, একত্রে আড্ডা মেরেছে এমন বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ভালো চাকরির ফলে ধনী হয়ে যায় এবং অন্য বন্ধুরা দরিদ্র থাকে তখন সে বন্ধুদের সাথে তার সাধারণত সুসম্পর্ক থাকে না। ধনী বন্ধুটি ছেলেবেলার দরিদ্র বন্ধুদের সাথে সাধারণত সম্পর্ক ভালো রাখতে চায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুলে যায় ছেলেবেলার বন্ধুদের সাথে মধুর স্মৃতি। অর্থের মোহে হয়ে ওঠে অহংকারী। অর্থের কারণে লোপ পায় হিতাহিত জ্ঞান। মূলত অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয় সমাজে কার সাথে সুসম্পর্ক রাখা যায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সাধারণত একই চিন্তাভাবনা কাজ করে। জ্ঞানী কখনো মূর্খকে বন্ধু হিসেবে স্বীকার করেন না। মানুষে মানুষে ভাই ভাই—মুখে এ কথা বললেও ভিতরটা অন্যরকম। এটাই সমাজের নিষ্ঠুর সত্য, শত শত বছর ধরে যা সমাজে প্রবহমান।

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা খুবই লোভী। তারা শুধু নিজেরাই ভালো থাকবে এ চিন্তা-চেতনায় মগ্ন থাকে। নিজের স্বার্থের বাইরে বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না। এ ধরনের মানুষ সমাজের জন্য খুবই ভয়ংকর। *মহাভারত* এ ধরনের মানুষদের নৃশংসতর হিসেবে অভিহিত করেছে,

> একঃ সম্পন্নমশ্নাতি বস্তে বাসশ্চ শোভনম্।
> যোঽসংবিভজ্য ভৃত্যেভ্যঃ কো নৃশংসতরস্ততঃ॥ উদ্‌যোগপর্ব ৩৩/৪৭ (বেদব্যাস ১৪২২: ২৫৩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একা ভালো খায়, ভালো পোশাক পরে, ভৃত্যদের কিছু দেয় না, তার চেয়ে নিষ্ঠুর আর কে আছে?

প্রকৃতপক্ষে এসব স্বার্থপর, লোভী মানুষ, সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। *মহাভারতে* লোভ থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হয়েছিলেন। শর্ত ছিল যারা পরাজিত হবে তারা বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকবে। যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের ও দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাস জীবন শেষে রাজ্যে ফিরে এসে রাজ্য দাবি করলে দুর্যোধন তা দিতে অস্বীকার করেন। শেষে যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাইয়ের জন্য মাত্র পাঁচটি গ্রাম দাবি করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাও দিতে অস্বীকার করেন। দুর্যোধন সামান্য কিছু ছাড় দিলে হয়তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবরা সমূলে বিনাশ হতেন না। কুরুক্ষেত্রে কৌরবরা ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসার অগ্নিতে মাত্র আঠারো দিনে জ্বলে নির্বংশ হয়ে গেলেন। আমাদের বর্তমান সমাজে দেখি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সমাজে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। কিছু দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মজুদ করে অধিক মুনাফা লাভের আশায়। ফলে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট দেখা দেয়। পরে তারা

অধিক মুনাফায় পণ্যগুলো বিক্রয় করে। এ স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীরা শুধু নিজেদের স্বার্থ বোঝে, সমাজের সাধারণ মানুষ নিয়ে তারা ভাবে না। এরা প্রকৃতপক্ষে লোভী, নৃশংস মানুষ। সমাজ এসব মানুষকে ভালো চোখে দেখে না। এরা সমাজ, দেশের জন্য বোঝা। কিন্তু অপরের উপকার সাধনের মধ্যে মানবজীবনের সুখ, সার্থকতা নির্ভরশীল। আত্মসুখ কখনো প্রকৃত সুখ নয়।

মহাভারতে মানুষকে সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। এ মহাকাব্যের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত, তখন যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

> ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ॥ শান্তিপর্ব ২৯২/২০ (বেদব্যাস ১৪২২: ৩০৪৩)

অর্থাৎ, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।

প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত সত্য। *মহাভারত* এ বিপ্লবী উক্তি করেছে। মানুষই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সমাজে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, সাদা-কালো কিংবা ধর্মীয় যে ভেদাভেদ রয়েছে এগুলো মানুষের বড় পরিচয় নয়। সমাজ আজও ঐশ্বর্য, আধিপত্য ও দাম্ভিকতার কাছে পরাজিত। কিন্তু মানুষের ঐশ্বর্য, স্থান, কাল, গোত্র কোনোটিই বিবেচ্য বিষয় নয়। জ্ঞানী, বীর, বিখ্যাত ব্যক্তি কিংবা পণ্ডিত বলে নয়, মানুষ বলেই মানুষ বড়। প্রশ্ন হতে পারে, *মহাভারতে*র বহু জায়গায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের গুণগান করা হয়েছে, তাহলে তাঁদের স্থান কোথায়? তাঁরা আর শূদ্র কি এক? ভীষ্মের উক্তি থেকে উত্তর পাওয়া যায়, হ্যাঁ, এক। কারণ তারা সকলেই মানুষ। যে জাতিভেদ প্রথা নিয়ে হিন্দু সমাজ জর্জরিত, ভীষ্মের এক কথায় তা শেষ হয়ে গেল। রইল কেবল এক জাতি, সেটা মানুষ জাতি। মানুষের বিকল্প আর কিছুই নেই, বিকল্প শুধু মানুষ। মধ্যযুগে এসেও আমরা একই উক্তি পাই,

> শুনো হে মানুষ ভাই
> সবার উপরে মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই।

আবার আধুনিক যুগে এসেও আমরা একই কথা পাই। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'মানুষ' কবিতায় লিখেছেন,

> গাহি সাম্যের গান—
> মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!

মহাকবি ভারবি সংস্কৃত সাহিত্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। তিনি দক্ষিণ ভারতের মানুষ। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে কোনো এক সময়ে ভারবি জন্মগ্রহণ করেন। ভারবি একটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম *কিরাতার্জুনীয়ম্*। এটি একটি মহাকাব্য। মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত বিখ্যাত মহাকাব্য *মহাভারতে*র বনপর্বই *কিরাতার্জুনীয়মে*র উৎস। এ মহাকাব্যটি আঠারোটি সর্গে বিভক্ত। *মহাভারতে*র বনপর্বের অন্তর্গত হলেও ভারবি স্বীয় সৃজনশক্তির বলে *কিরাতার্জুনীয়ম*কে অনন্য মর্যাদায় নিয়ে গিয়েছেন। যার ফলে একটি মাত্র কাব্য রচনা করেও

ভারবি সংস্কৃত সাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর রচনায় প্রচুর সুভাষিত রয়েছে। এ সুভাষিতের মাধ্যমে সমাজের বিচিত্র দিক তুলে ধরা হয়েছে। *কিরাতার্জুনীয়মের* ১ম সর্গে দেখা যায়, পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের ও দ্রৌপদীকে নিয়ে দ্বৈতবনে বাস করছেন। পাশা খেলার শর্ত অনুসারে তাঁদের বারো বছর বনে বাস করতে হবে আর এক বছর অজ্ঞাতবাস। তারপর পুনরায় রাজ্য ফিরে পাবেন। কিন্তু দুর্যোধনের আচরণে পাণ্ডবদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। তাঁরা ভেবেছিলেন দুর্যোধন তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না। তাই বনবাসী এক কিরাতকে চর নিযুক্ত করে যুধিষ্ঠির কুরু রাজ্যের খোঁজখবর নিতে পাঠালেন। কিরাত কুরু রাজ্যের সমস্ত তথ্য জেনে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে সব বললেন। একজন গুপ্তচরের কর্তব্য হচ্ছে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা। ফলে রাজা সঠিক পরিকল্পনা করতে পারেন। কিরাত তাই কুরু রাজ্যের সঠিক তথ্য যুধিষ্ঠিরের কাছে বলতে গিয়ে বলেছিলেন—

> ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো
> ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোনুজীবিভিঃ॥
> অতোর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
> হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ॥ ১/4 (ভারবি ১৯৯২: ৪৭)

অর্থাৎ, হে মহারাজা! চরদের চোখ দিয়ে যেসব প্রভুগণ দেখেন তাঁদের প্রতারিত করা উচিত নয়। অতএব, আমার বাক্য প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক আপনি তা ক্ষমা করবেন। কেননা হিতকর এবং প্রিয়বাক্য সত্যই দুর্লভ।

এখানে চর চমৎকার কথা বলেছেন—

> হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।

অর্থাৎ, হিতকর অথচ প্রিয়বাক্য সত্যই দুর্লভ।

সমাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যেসব কথাবার্তা বা বক্তব্য মানুষের জন্য মঙ্গলকর বা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে সেগুলো শুনতে সাধারণত কটু বা তিক্ত মনে হয়। আর যেসব কথা শুনতে খুব মধুর হয় তা বেশির ভাগ সময় মঙ্গলজনক হয় না। মানুষ সবসময় পছন্দ করে প্রশংসাসূচক কথা শুনতে বা বলতে, যেটাকে সহজ বাংলায় বলা হয় তেলযুক্ত কথা। কিন্তু এগুলো সমাজের জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। প্রিয় কথা বলা লোকের সংখ্যা সমাজে প্রচুর বিদ্যমান। *রামায়ণে* আছে,

> সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ॥ অরণ্যকাণ্ড ৩৭/২ (বাল্মীকি ১৯৯৬: ৫৬৪)

অর্থাৎ, হে রাজন্, প্রিয় কথা বলে এ রকম লোক সবসময় সহজে পাওয়া যায়।

কিন্তু সমাজে এই দু ধরনের কথাবার্তার সমন্বয় অর্থাৎ মঙ্গলজনক এবং প্রিয়বাক্য খুবই কম। বর্তমান সমাজেও একই অবস্থা বিদ্যমান। বর্তমান সমাজে আমরা দেখি, মানুষ যেসব কথা শুনলে খুশি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ সে কথাগুলো বলে। এসব কথা মঙ্গলজনক কি না

এটার গুরুত্ব তেমন থাকে না। কিছু ব্যতিক্রম সব সমাজে থাকে, কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই।

সমাজে বাস করতে গেলে সবার সাথে ভালো সম্পর্ক থাকবে এমন কোনো কথা নেই। একজন ভালো মনের মানুষের সাথে সম্পর্ক খারাপ হলেও তার দ্বারা খুব বেশি ক্ষতি হয় না। কিন্তু খারাপ মানুষের সাথে সম্পর্ক ভালো হলেও শেষ পর্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। *কিরাতার্জুনীয়মে* বলা হয়েছে,

> অনার্য-সঙ্গমাদ্ বরং বিরোধোপি সমং মহাত্মাভিঃ॥ ১/৮ (ভারবি ১৯৯২: ৫২)

অর্থাৎ, খারাপ মানুষের সাথে বন্ধুত্বের চেয়ে ভালো মানুষের সঙ্গে বিরোধও বরং ভালো।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষকে জ্ঞানী-মূর্খ, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, গুণী-নির্গুণ নানা রকম মানুষের সাথে চলতে হয়। কিন্তু সঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিবেচনা হলো গুণী মানুষের সংস্পর্শে আসা। ভালো মানুষের সংস্পর্শে আসলে জীবন হয়ে ওঠে সুখকর। একজন উন্নত চরিত্রের মানুষ কখনো অন্যকে অসৎ উপদেশ দেন না, অপরের ক্ষতি করেন না। এ ধরনের মানুষের সাথে যদি সম্পর্ক ভালো নাও থাকে, কিংবা বিরোধ থাকে, তাহলেও তাঁর দ্বারা তেমন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ মানবিক মানুষ কখনো অন্যের ক্ষতি করেন না। অন্যদিকে চরিত্রহীন দুর্জন মানুষ পশুতুল্য। দুর্জনের স্বভাবই হচ্ছে অন্যের ক্ষতি করা। এদের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকলেও সুযোগ পেলে এরা বন্ধুর ক্ষতি করে থাকে। দুর্জনের কখনও বন্ধু হয় না, স্বার্থের কারণে অনেক সময় বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে কিন্তু সুযোগ পেলেই ক্ষতি করে থাকে। তাই দুর্জনের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকলেও তাকে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু সজ্জনকে বিশ্বাস করা যায়। কারণ সজ্জন ব্যক্তির মন-মানসিকতা ও বিবেচনাবোধ তাকে মানবিক করে তোলে। এ মানবিকতা তাকে শত্রুর প্রতিও সহানুভূতিশীল ও বিবেচক হতে প্রেরণা যোগায়।

কিরাতার্জুনীয়মে কিরাত যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করে চমৎকার একটি কথা বলেছেন,

> অহো দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা। ১/২৩ (ভারবি ১৯৯২: ৬৭)

অর্থাৎ, বলবানের সঙ্গে বিরোধিতা করা প্রকৃত অর্থেই ভয়ংকর।

মানবসমাজ নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যে, যারা প্রতিপত্তিশালী তাদেরকে সাধারণত সমাজের সাধারণ মানুষেরা স্তুতি বা প্রশংসার মাধ্যমে মন জয় করার চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষ ধনী, বিত্তশালী বা ক্ষমতাবানদের প্রশংসা করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ে সবসময় তৎপর থাকে। স্তুতির মাধ্যমে সবসময় তারা নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে নেয়। সমাজের সমস্যা-জর্জরিত মানুষ সাধারণত যেকোনো সমস্যায় দুর্বলের কাছে কখনো যায় না। তারা মনে করে দুর্বলেরা সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাই তারা সবলের কাছে ছুটে যায়। দুর্বলেরা যদি কখনো সবলের বিরুদ্ধে যায় তখন দুর্বলকে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের পদে পদে বিভিন্ন রকম বাধা আসে। ক্ষমতাশালীরা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বা নিজস্ব বাহিনী ব্যবহার করে দুর্বলদের নিঃশেষ করে ফেলে। দুর্বলেরা সমাজ, রাষ্ট্র কারও কাছ থেকে তেমন

কোনো সুবিচার পায় না। সমাজে প্রভাবশালীরা বড় বড় অপরাধ করলেও তাদের সাধারণত তেমন কিছু হয় না। বিচারের বাণী চিরদিনই নিভৃতে কাঁদে। সমাজের সাধারণ মানুষ সবই দেখে, বোঝে, কিন্তু শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে যেয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। বৈশ্বিক রাজনীতির দিকে তাকালে আমরা একই অবস্থা দেখি। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো সবসময় দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে ঋণসহ বিভিন্ন ফাঁদে ফেলে। তারা ছলে, বলে, কৌশলে দুর্বলকে শোষণ করে এবং তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে। দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেয় না। বিভিন্ন রকম নিষেধাজ্ঞা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলো শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর কাছে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করে। তাই বুদ্ধিমানেরা বলবানের সাথে তেমন বিরোধিতা করেন না, কৌশলে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন।

যেকোনো কাজ জেনে, বুঝে, চিন্তা-ভাবনা করে করা উচিত। তাহলে সে কাজে সফলতা আসে। বুদ্ধিমান মানুষেরা এভাবেই কাজগুলো করেন। *কিরাতার্জুনীয়মে*র দ্বিতীয় সর্গে আমরা এ রকম একটি চমৎকার উক্তি পাই,

> সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্। ২/৩০ (ভারবি ১৯৯৪: ৩৭)

অর্থাৎ, হঠাৎ কোনো কাজ করা উচিত নয়।

কিরাতার্জুনীয়মে এ উক্তিটি করেছিলেন যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী ও ভীম যখন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন, তখন ভীমের কথার পরিপ্রেক্ষিতে যুধিষ্ঠির এ উক্তিটি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি না বুঝে, না জেনে কোনো কাজ করা উচিত নয়। ধৈর্য ধরে সমস্যার মোকাবেলা করে জীবনে সফল হতে হয়। তাই সমাজের যেসব মানুষ সহনশীল বা ধৈর্যশীল তাঁরাই সর্বত্র সফলতা লাভ করেন। মানুষের জীবন পুষ্পসজ্জিত নয়, জীবন কণ্টকাকীর্ণ। মানুষকে এ কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে, বিভিন্ন বাধা বিপত্তি দূর করে, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আর এ সফলতার পিছনে অন্যতম গুণ হলো ধৈর্য। যাঁরা ধৈর্যশীল তাঁরা সমস্ত বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে লক্ষ্যস্থলে সহজে পৌঁছাতে পারেন। অপরদিকে যাদের ধৈর্য নেই তারা হঠাৎ করে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং এ হঠাৎ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়ই ভুল হয়ে থাকে। *রামায়ণে* আমরা দেখি রাবণ যদি তাঁর ভাই বিভীষণের কথা শুনে, বুঝে সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে হয়তো লঙ্কানগরী ধ্বংস হতো না। *মহাভারতেও* দুর্যোধন যদি চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করতেন তাহলে কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যেত না। তাই সমাজের বুদ্ধিমান মানুষেরা ভেবে-চিন্তে, ধীর-স্থীরভাবে সিদ্ধান্ত নেন এবং সফল হন। তাই হঠাৎ করে কোনো কাজ করা আসলেই ঠিক নয়, করলেও সে কাজে তেমন সফলতা আসে না।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *পঞ্চতন্ত্র*। এটি গল্পগ্রন্থ, রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা। ধারণা করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে *পঞ্চতন্ত্র*। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা ছিলেন অমরশক্তি। তার ছিল তিন পুত্র—বসুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনেকশক্তি। তিন জনেরই লেখাপড়ায় কোনো আগ্রহ ছিল না, ছিল মূর্খ। তাই ছেলেদের নিয়ে রাজা অমরশক্তি খুবই চিন্তিত ছিলেন। শেষে বিষ্ণুশর্মা নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের

কাছে তিন ছেলের লেখাপড়ার দায়িত্ব দিলেন। বিষ্ণুশর্মা ছয় মাসের মধ্যে তাদের পণ্ডিত করে তোলার আশ্বাস দিলেন। বিষ্ণুশর্মা অমরশক্তির তিন পুত্রকে শেখানোর জন্য সর্ব শাস্ত্রের সারসংক্ষেপ নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। এটি *পঞ্চতন্ত্র* নামে পরিচিত। পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত বলে এর নাম *পঞ্চতন্ত্র*। এ পাঁচটি তন্ত্র হচ্ছে মিত্রভেদ (বন্ধু-বিচ্ছেদ), মিত্রপ্রাপ্তি (বন্ধুলাভ), কাকোলূকীয় (চিরশত্রুতা), লব্ধপ্রণাশ (পেয়ে হারানো) ও অপরীক্ষিতকারক (না ভেবে কাজ করা)। প্রতিটি তন্ত্রে আছে একাধিক ছোট গল্প। বিষ্ণুশর্মা গল্পের মাধ্যমে সহজ ভাষায় সমাজ, মানুষের আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন।

পঞ্চতন্ত্রে লেখক গল্পের চরিত্র হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশু-পাখিকে এনেছেন। এখানে পশু-পাখিরা মানুষের মতো জ্ঞানের কথা, শাস্ত্রের কথা, সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য, অপরকে ঠকিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছে। *পঞ্চতন্ত্রে* গল্পের চরিত্র হিসেবে পশু-পাখি ব্যবহার করলেও মূলত তুলে ধরা হয়েছে মানব চরিত্রকে। সমাজে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ভালো-মন্দ, অজ্ঞতা-বিচক্ষণতা প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে গল্পগুলোতে। *পঞ্চতন্ত্রে* বহু সুভাষিত রয়েছে। এ সুভাষিতের মাধ্যমে আমরা তৎকালীন মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে সহজভাবে বুঝতে পারি। *পঞ্চতন্ত্রে* বলা হয়েছে,

> অর্থেন বলবান্ সর্বো অর্থযুক্তঃ স পণ্ডিতঃ। মিত্রপ্রাপ্তি ৮৭ (বিষ্ণুশর্মা ২০১৪: ৩০৪)

অর্থাৎ, টাকা পয়সা যদি থাকে তাহলে মানুষ শক্তিশালী, টাকা থাকলেই জ্ঞানী।

বিষ্ণুশর্মা প্রকৃতপক্ষে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজে সাধারণত যার কাছে অর্থ আছে সমাজ তাকে সম্মানের চোখে দেখে। সমাজ তাকে ভালোবাসে। সমাজে বিত্তশালী মানুষ যে কথাগুলো বলে, অধিকাংশ মানুষ সেগুলো মেনে চলে। সমাজ সবসময় ধনীদের অতিরিক্ত মূল্যায়ন করে। ধনী ব্যক্তি টাকার শক্তিতে কাউকে তোয়াক্কা করে না। সমাজের চাটুকারেরা সবসময় ধনী শ্রেণির পাশে ঘোরাঘুরি করে। বর্তমান সমাজ বিশ্লেষণ করলেও আমরা দেখি যার কাছে প্রচুর অর্থ আছে সে সমাজে সব থেকে গুণী, সম্মানী ব্যক্তি। শিক্ষা-দীক্ষায় তেমন না হলেও বড় বড় অনুষ্ঠানে তাকে গুণীজন হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। রাতারাতি হয়ে যায় বিশিষ্ট সমাজসেবক। কিন্তু যার অর্থ নেই সমাজ তাকে সঠিক মূল্যায়ন করে না। দরিদ্রকে সমাজ কোনো সম্মান দেয় না। পরের শ্লোকে বলা হয়েছে,

> তথার্থেন বিহীনো ত্র পুরুষো নামধারকঃ। মিত্রপ্রাপ্তি ৮৮ (বিষ্ণুশর্মা ২০১৪: ৩০৪)

অর্থাৎ, অর্থ-সম্পদবিহীন মানুষ নামে মাত্রই পুরুষ।

অর্থাৎ, সমাজে অর্থহীন মানুষের কোনো মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে এটাই চরম সত্য, এটাই জীবনদর্শন। যার কাছে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ আছে সে সমাজে সর্বেসর্বা। আর যার অর্থ নেই তাকে খুব কাছের আত্মীয়-স্বজনও তার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায় না। সমাজে তার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে না। সকলে তার থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। এমনকি

পরিবারের যারা খুব কাছের তারাও তাকে সঠিক মূল্যায়ন করে না। আসলে সমাজের বেশির ভাগ মানুষ লোভী, স্বার্থপর শ্রেণির। ধনী শ্রেণির কাছ থেকে মানুষ বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশা করে। তাই মানুষ সাধারণত সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। সমাজে বিত্তশালী, ক্ষমতাধর মানুষদের চাটুকারিতা করা যেন সমাজের সাধারণ মানুষের রীতি। সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত গ্রন্থ *মৃচ্ছকটিক*। *মৃচ্ছকটিকে*র নায়ক চারুদত্ত। প্রথম জীবনে তিনি ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রচুর দান করার ফলে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। যখন তিনি ধনী ছিলেন প্রচুর লোকজন তাঁর সাথে থাকতেন। সমাজ তাঁকে সমীহ করত, মুল্যায়ন করত। কিন্তু দরিদ্র হওয়ার পরে কেউ আর তাঁর পাশে নেই। তাই বিদূষক যখন তাঁকে বলেছিলেন দারিদ্র্য ও মৃত্যুর মধ্যে কোনটি তিনি বেছে নিবেন, তখন চারুদত্ত বলেছিলেন,

> দারিদ্র্যান্মরণাদ্বা মরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্।
> অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্॥ ১/১১ (শূদ্রক ২০০৭: ২৭)

অর্থাৎ, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুই বরং ভালো, দারিদ্র্য নয়। কারণ মৃত্যুর দুঃখ অল্প কিন্তু দারিদ্র্যের দুঃখের পরিমাণ অনেক।

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট গুণগুলোর মধ্যে চরিত্র অন্যতম। *পঞ্চতন্ত্রে* বলা হয়েছে,

> বিভূষণং শীলসমং ন চান্যৎ। মিত্রপ্রাপ্তি ১৬২ (বিষ্ণুশর্মা ২০১৪: ৩১৩)

অর্থাৎ, চরিত্রের তুলনায় অলংকার নেই।

প্রকৃতপক্ষে চরিত্রই মানুষের সবচেয়ে বড় অলংকার, এটাই সর্বকালের জন্য চরম সত্য। চরিত্র মানুষকে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরে। চরিত্রবান মানুষ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হন। ফুলের গন্ধ যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের হৃদয়কে বিমোহিত করে তেমনি মহৎ চরিত্রের সৌন্দর্য সকলের মন আকৃষ্ট করে। সচ্চরিত্র মানুষ সর্বকালে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। সুন্দর চরিত্র মানুষকে যথার্থ মানুষ করে তোলে। মহামানবদের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে এ সত্যতা সহজে ধরা পড়ে। মহামানবেরা সুন্দর চরিত্রের কারণে যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে সমাজে সুপরিচিত। অন্যদিকে চরিত্রহীন মানুষ সমাজের কলঙ্ক। চরিত্রহীন মানুষ সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে। তাই নিজেকে সমাজে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন অলংকার যেমন মানুষকে সুন্দর করে তোলে, সচ্চরিত্র তেমনি মানুষের বড় অলংকার। এ অলংকার মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সহায়তা করে।

আমাদের এ সুন্দর পৃথিবী দিন দিন বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। দেশে দেশে যুদ্ধ, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানির ফলে মানবসভ্যতা আজ ধ্বংসের মুখে। এ ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে মানবতাবিরোধী অপরাধগুলো থেকে সরে আসতে হবে,

সবাইকে আপন ভাবতে হবে। *পঞ্চতন্ত্রে* খুব সুন্দর একটি কথা বলা হয়েছে,

> বসুধৈব কুটুম্বকম্॥ অপরীক্ষিত-কারক ৩৮ (বিষ্ণুশর্মা ২০১৪: ৩৭৪)

অর্থাৎ, সারা পৃথিবী আমার আত্মীয় বা পরিবার।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। পরিশ্রম, সাধনা, যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষ প্রমাণ করেছে সে শ্রেষ্ঠ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের বড় পরিচয় সে মানুষ। প্রেম, দয়া, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। মানবিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মানুষ এসব গুণ সমাজের উন্নতিকল্পে, সমাজে সম্প্রীতির বন্ধনে কাজে লাগায়। আজকের পৃথিবী বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি সর্বত্র ভাইয়ে-ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব, একে অপরের সঙ্গে, এক দেশ আরেক দেশের সঙ্গে বিভিন্ন বিবাদে, যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কোটি কোটি ডলার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে হচ্ছে অস্ত্র তৈরি, ক্রয়-বিক্রয়ে। পারমাণবিক বোমা থেকে শুরু করে অন্যান্য অস্ত্রাদি তৈরি হচ্ছে মানুষকে মারার জন্য, সভ্যতা ধ্বংসের জন্য। প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন মারণাস্ত্র। ফলে মানুষের কান্না আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস। কিন্তু আমরা যদি সমস্ত পৃথিবীকে পরিবারের মতো মনে করি, মনে করি সকলে আমাদের আত্মীয় তাহলে পৃথিবীর অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। নিজে ব্যথা পেলে যেমন কষ্ট লাগে, অন্য জন ব্যথা পেলেও সে রকম কষ্ট লাগে, এ উপলব্ধি মানুষের মধ্যে এলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। সীমান্তের বেড়াজাল ভেঙে সকল মানুষকে যদি ভাবি আমাদের আপনজন তাহলে একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী গঠন সম্ভব। তাই পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সুন্দর একটি বাসযোগ্য পৃথিবী তুলে দেওয়ার স্বার্থে পৃথিবীর সকলকে আপন করে নেওয়া আবশ্যক।

এ পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ও উপকারী বন্ধু হলো গাছ। সম্ভবত গাছের ছায়াতলে মানবসভ্যতার গোড়াপত্তন। তাই জীবন ও বৃক্ষ যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বৃক্ষ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মানুষের সীমাহীন লোভ, দুর্নীতি, অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে প্রকৃতি আজ বিপন্ন। মানুষ বিভিন্নভাবে পরিবেশ ধ্বংসকারী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, তথাকথিত উন্নয়নের নামে মানুষ অযথা বৃক্ষ নিধন করে যাচ্ছে। ফলে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে ভারসাম্যহীন, উষ্ণ, রুক্ষ ও ভয়ংকর। অযথা পশু-পাখি হত্যা ও তাদের পর্যাপ্ত বাসস্থানের অভাবে পরিবেশ হয়ে পড়ছে শ্রীহীন। ফলে মানবসভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে সেই সুপ্রাচীনকালে পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার কথা বলা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রে* বৃক্ষনিধন ও অকারণে প্রাণীহত্যার নিন্দা করা হয়েছে,

> বৃক্ষাংশ্ছিত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।
> যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গে নরকং কেন গম্যতে॥ কাকোলূকীয় ১০৬ (বিষ্ণুশর্মা ২০১৪: ৩২৮)

অর্থাৎ, গাছ কেটে, পশু হত্যা করে, পশুর রক্তে মাটি ভিজিয়ে কাদা করে যদি স্বর্গে যেতে হয়, তবে নরকের পথ কোনটা?

মহাকবি কালিদাস ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। পরিবেশ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি তাঁর *অভিজ্ঞানশকুন্তলমে* শকুন্তলাকে যেন প্রকৃতির কন্যা হিসেবে তৈরি করেছেন। বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পল্লবে ভরা কণ্বমুনির তপোবন ছিল প্রকৃতির অভয়াশ্রম। এখানে প্রকৃতি ও আশ্রমবাসীর সম্পর্ক যেন একে অপরের আত্মীয়। তাই আশ্রমের এক তাপস দুষ্যন্তকে হরিণ মারতে নিষেধ করে বলেন,

> ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
> ক্ক বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং
> ক্ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥ ১/১০ (কালিদাস ২০১৬: ৪০)

অর্থাৎ, এ নরম তুলতুলে হরিণের দেহে এ বাণ নিক্ষেপ করবেন না। এ বাণ তুলোয় আগুন লাগানোর মতো। হরিণের জীবন খুবই কোমল, কিন্তু আপনার এ তীক্ষ্ণ বাণ বজ্রসম।

মহাভারতে বৃক্ষকে পুত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে,

> তস্য পুত্রা ভবন্ত্যেতে পাদপা নাত্র সংশয়ঃ। অনুশাসন ৪৭/২৭ (বেদব্যাস ১৪২২: ৭৩৮)

—বৃক্ষ রোপণকর্তার পুত্র তুল্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাভারতে আরো বলা হয়েছে,

> তস্মাত্তড়াগে সদ্বৃক্ষা রোপ্যাঃ শ্রেয়োঽর্থিনা সদা।
> পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ পুত্রাস্তে ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ॥ অনুশাসন ৪৭/৩১ (বেদব্যাস ১৪২২: ৭৩৮)

—যারা কল্যাণকামী মানুষ, তাঁরা জলাশয়ের তীরে উৎকৃষ্ট বৃক্ষরোপণ করবেন এবং তাদের পুত্রের মতো সবসময় পরিপালন করবেন। কেননা সে বৃক্ষ ধর্ম অনুসারে যে রোপণ করে তার পুত্রই হয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও আমরা বৃক্ষপ্রেমের উল্লেখ পাই। সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা সবুজায়ন করেছেন তাঁদের কর্মকে এখানে উৎসাহিত করা হয়েছে। কৌটিল্য বলেছেন,

> অন্যেষাং চ বধ্নতাং ভূমিমার্গবৃক্ষোপকরণানুগ্রহং কুর্যাৎ,
> পুণ্যস্থানারামাণাং চ। ২/১/৪ (কৌটিল্য ২০১৪: ১৯৮)

অর্থাৎ, দেবালয় প্রভৃতি পুণ্যস্থান, উদ্যান ইত্যাদি নির্মাণে কেউ উৎসাহী হলে রাজা তাঁদের ভূমি, মার্গ, বৃক্ষোপকরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁদের সাহায্য করবেন।

এছাড়া কৌটিল্য পশু-পাখি সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। অর্থশাস্ত্রে আমরা দেখি পশু-পাখি হত্যাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ অপরাধের কারণে নানা রকম জরিমানা ও দণ্ডের বিধান ছিল,

> স্বয়ং হন্তা ঘাতয়িতা হর্তা হারয়িতা চ বধ্যঃ। ২/২৯/৫ (কৌটিল্য ২০১৪: ৫০৬)

অর্থাৎ, যে গোপালক নিজে অথবা অন্যকে দিয়ে গবাদি পশু হত্যা বা হরণ করায় তার ওপর রাজা বধদণ্ড আরোপ করবেন।

*রামায়ণে*ও দেখা যায়, বৃক্ষ ও পশু-পাখি সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। *রামায়ণে* ভরত যখন রামের সন্ধানে ভরদ্বাজ ঋষির তপোবনে এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে কেবল ঋষি বশিষ্ঠ ছিলেন, সেনাবাহিনী বেশ দূরে ছিল। এটা জানতে পেরে ঋষি ভরতকে সেনাবাহিনী না আনার কারণ জিজ্ঞেসা করলে ভরত বলেছিলেন,

> তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।
> ন হিংস্যুরিতি তেনাহমেক এবাগতস্ততঃ॥ অযোধ্যাকাণ্ড ৯১/৯ (বাল্মীকি ১৯৯৬: ৪০৯)

—তাদের দ্বারা যেন আশ্রমের বৃক্ষ, জল, ভূমি এবং পর্ণশালাগুলোর কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য আমি একাই এসেছি।

আসলে প্রকৃতি ধ্বংস করে মহৎ কিছু হয় না। আজ আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মূলত নিজেদের ধ্বংসই ডেকে আনছি। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যগুলো আলোচনা করলে দেখা যায়, পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে তৎকালীন সমাজ যথেষ্ট সচেতন ছিল। আমাদেরও বিভিন্ন উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সরকারের পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিকের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্ সংস্কৃত সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। চাণক্য ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, দার্শনিক এবং কূটনীতিবিদ। অবিভক্ত ভারতের তক্ষশীলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক ছিল তাঁর সময়কাল। তিনি কৌটিল্য নামেও পরিচিত। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য উপদেশ এবং বিভিন্ন নীতিবাক্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ *চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র*। তাঁর এ গ্রন্থ একটি উপদেশমালা। এ গ্রন্থে বহু সুন্দর উক্তি রয়েছে। চাণক্য বলেছেন,

> স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ ১ (চাণক্য ১৯৯০: ৩)

অর্থাৎ, রাজা শুধু নিজের দেশে পূজিত হন কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বত্র সম্মান পেয়ে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। মানবজীবন গঠন ও সুন্দরভাবে বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হচ্ছে বিদ্যা। আর এ বিদ্যাকে যিনি সঠিকভাবে আত্মস্থ করেছেন তিনি বিদ্বান। বিদ্বান ব্যক্তির সম্মান দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর মানুষ তাঁদের যুগে যুগে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। বিভিন্ন মনীষীকে মানুষ সম্মান করে তাঁদের জ্ঞানের জন্য। মনীষীরা তাঁদের জ্ঞান বিতরণ করেছেন পৃথিবীর মানুষের জন্য। ফলে পৃথিবী হয়ে উঠেছে সুন্দর, বাসযোগ্য। একজন রাজা বা শাসককে মানুষ সম্মান নাও করতে পারে। তার মৃত্যুর পর সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে মনে রাখে না।

কিন্তু বিদ্বানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। পৃথিবী বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত থাকলেও বিদ্যা মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে। শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। বিদ্যা তাই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। চাণক্য বলেছেন,

> ন বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন। ৭৩ (চাণক্য ১৯৯০: ৭১)

অর্থাৎ, বিদ্যার সমান বন্ধু নেই।

আর যাদের বিদ্যা শিক্ষা নেই তারা সমাজের বোঝা। সমাজ তাদের কোনো মূল্য দেয় না। তাদের সারাজীবন অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কাটাতে হয়। যে বিদ্যা থেকে দূরে থাকে সে সব দিক থেকে বঞ্চিত হয়। জ্ঞানের চোখ না থাকার কারণে জীবনের সুন্দর দিকগুলো তাদের কাছে দৃশ্যমান হয় না। সারাজীবন তাদের অন্ধকারে কাটাতে হয়। বেঁচে থেকেও তারা যেন মৃত। বিদ্যাহীন জীবনযাপন পশুর জীবনধারণের তুল্য। চাণক্য তাই বলেছেন,

> অবিদ্যং জীবনং শূন্যম্। ৪৪ (চাণক্য ১৯৯০: ৪৩)

অর্থাৎ, যার বিদ্যা নেই তার জীবন শূন্য।

বন্ধু মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুবিহীন সমাজ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু ভালো বন্ধু নির্বাচন করা খুব কঠিন কাজ। সমাজে প্রকৃত বন্ধু সম্পর্কে চাণক্য চমৎকার কথা বলেছেন,

> উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
> রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ১৫ (চাণক্য ১৯৯০: ১৫)

অর্থাৎ, যিনি আনন্দ-উৎসবে, বিপদের সময়, দুর্ভিক্ষে, শত্রুর সাথে যুদ্ধের সময়ে, বিচারালয়ে, মৃতদেহ সৎকার কাজে পাশে উপস্থিত থাকেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

সমাজে বাস করতে হলে অবশ্যই বন্ধু দরকার। বন্ধু আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ। আমাদের মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য ভালো বন্ধু প্রয়োজন। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ একাকী থাকতে পারে না। নিঃসঙ্গতা দূর করা, বিপদে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন। একজন প্রকৃত বন্ধু জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় সবসময় সহযোগী হয়। কিন্তু সমাজে প্রকৃত বন্ধুর দেখা পাওয়া খুবই কঠিন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের সুখের সময় অনেক বন্ধুর আগমন ঘটে। কিন্তু বিপদের দিনে এসব বসন্তের কোকিলকে পাওয়া যায় না। এটাই সমাজের বাস্তব চিত্র। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু আনন্দের দিনে নয়, দুঃখের দিনেও অংশীদার হয়, প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকে আচ্ছন্ন হয়, শবদাহে এগিয়ে আসে, সেই প্রকৃত বন্ধু। যারা প্রকৃত বন্ধু নয় তারা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে দূরে সরে যায়। সামাজিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কিছু মানুষ আছে যারা স্বার্থ হাসিলের জন্য সামনে এসে বন্ধুত্ব দেখায়। খুব সুন্দর কথা বলে মানুষের মন জয় করে নেয়। সমাজের ভালো মানুষেরা এদের মিষ্টি কথায় ভুলে এদের বিশ্বাস করে। এসব ব্যক্তি বিশ্বাস অর্জন করে পরে বন্ধুরই ক্ষতি করে।

চাণক্য এসব ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন। চাণক্য বলেছেন,

> পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
> বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥ ১৬ (চাণক্য ১৯৯০: ১৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামনে এসে মিষ্টি কথা বলে কিন্তু অসাক্ষাতে কাজের ক্ষতি করে থাকে, এসব বন্ধুদের ত্যাগ করা উচিত।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি অতিরিক্ত কোনো কিছু ভালো নয়। এটা প্রত্যেক মানুষ ও সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর। চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে আছে,

> অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
> অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্॥ ৪৮ (চাণক্য ১৯৯০: ৪৭)

অর্থাৎ, বেশি অহংকারের ফলে লঙ্কা নগরী বিনষ্ট হয়েছিল; অতি অভিমান থাকার কারণে কৌরবরা ধ্বংস হয়েছিল; অতিরিক্ত দানের কারণে বলি সত্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল; কোনো কিছুরই অতিরিক্ত ভালো নয়।

প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত কোনো বিষয় সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। কোনো বিষয় নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে তার পরিণাম খুব ভয়ংকর হয়। এটা সব সমাজের জন্য প্রযোজ্য। সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। *রামায়ণে* আমরা দেখি লঙ্কার অধিপতি রাবণের অতিরিক্ত অহংকারের ফলে লঙ্কা নগরী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। *রামায়ণে* রাবণ রামের স্ত্রী সীতাদেবীকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রামের বানর সেনা হনুমান সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। হনুমান বলেন,

> তৎ ত্রিকালহিতং বাক্যং ধর্মমর্থানুযায়ি চ।
> মন্যস্ব নরদেবায় জানকী প্রতিদীয়তাম্॥ সুন্দরকাণ্ড ৫১/২১ (বাল্মীকি ১৯৯৬: ১৬২)

অর্থাৎ, তাই ত্রিকালের জন্য মঙ্গলকর এবং ধর্মসঙ্গত কথা আমি বলছি। আপনি অনুগ্রহ করে এগুলো মেনে নিন। মনুষ্য সমাজে দেবতা হলেন রাম। সীতাকে তাঁর কাছে সমর্পণ করুন।

হনুমানের এ কথা শুনে রাবণ ভীষণ রেগে গেলেন এবং হনুমানকে হত্যার আদেশ দিলেন। রাবণকে শান্ত করতে গিয়ে বিভীষণ বলেছিলেন, দূতকে হত্যা করতে নেই। বিখ্যাত রাজারা কখনো দূতকে হত্যা করেন না। তবুও রাবণ বানর-সেনার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন,

> ন পাপানাং বধে পাপং বিদ্যতে শত্রুসূদন।
> তস্মাদিমং বধিষ্যামি বানরং পাপকারিণম্॥ সুন্দরকাণ্ড ৫২/১১ (বাল্মীকি ১৯৯৬: ১৬৫)

—হে শত্রুসূদন! যারা পাপ কাজ করে তাদের হত্যা করলে পাপ হয় না। তাই এ পাপী বানরকে আমি বধ করব।

প্রকৃতপক্ষে রাবণ ছিলেন অত্যধিক দাম্ভিক, আত্ম-অহংকারী। আর এ অতিরিক্ত অহংকারের কারণে রাম-রাবণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ ভয়ংকর যুদ্ধে লঙ্কা নগরী ধ্বংস হয়ে যায় এবং রাবণ নিহত হন। তাই অতিরিক্ত দম্ভ কখনো ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না।

মহাভারতে কৌরবরা ছিলেন অত্যধিক অভিমানী, অহংকারী। তাঁরা পাণ্ডবদের রাজ্যের বিন্দুমাত্র অংশ দিতে রাজি ছিলেন না। যুধিষ্ঠির তখন সঞ্জয়ের মাধ্যমে কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত আর অন্য একটি গ্রাম দান করতে বলেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন আত্ম-অভিমানের কারণে পাণ্ডবদের কোনো কিছুই দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন,

> যাবদ্ধি সূচ্যাস্তীক্ষ্ণায়া বিধ্যেদগ্রেণ মারিষ।
> তাবদপ্যপরিত্যাজং ভূমেন পাণ্ডবান্ প্রতি॥ উদ্‌যোগপর্ব ৫৭/৮০ (বেদব্যাস ১৪২২: ৬২৩)

অর্থাৎ, সুতীক্ষ্ণ সুচের মাথায় যতটুকু স্থান বিদ্ধ করা যায়, ভূমির ততটুকু স্থানও আমি পাণ্ডবদের দেব না।

দুর্যোধনের অতিরিক্ত অভিমানের কারণে শেষ পর্যন্ত ভয়ংকর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে কৌরবরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছিলেন। অতএব অতিরিক্ত কোনো কিছু ভালো নয়।

দান মহৎ কাজ, যাঁরা নিঃস্বার্থ দান করেন সমাজ তাঁদের সম্মান করে, ভালোবাসে। আমাদের সমাজে তাঁদের দানবীর বলা হয়। সমাজে ধনী শ্রেণির দানের কারণে সমাজের অবহেলিত মানুষেরা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে দ্রুত এগিয়ে যায়। সমাজ থেকে ধন-বৈষম্য কিছুটা হলেও দূরীভূত হয়। তাই সব সমাজে দানের প্রশংসা করা হয়, দান করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু অতিরিক্ত দান ভালো নয়। অতিরিক্ত দান যিনি করেন এ দান তাঁর নিজের জন্য মাঝে মাঝে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। পৌরাণিক কাহিনি থেকে জানা যায়, দৈত্যরাজ বলি ছিলেন বিখ্যাত দানবীর। কেউ কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। একবার স্বর্গ থেকে বিচ্যুত দেবতারা নারায়ণকে পাঠালেন বলির কাছে। নারায়ণ বামনের রূপ ধারণ করে বলির নিকট আসলেন এবং তিন পা সমান ভূমি প্রার্থনা করলেন,

> মমাগ্নিশরণার্থায় দেহি রাজন্ পদত্রয়ম্। বামনপুরাণ ৩১/৪৯ (বেদব্যাস ১৩৯৬: ১৩১)

অর্থাৎ, আমার অগ্নি রক্ষার জন্য আপনি আমাকে তিন বার পদক্ষেপ করার মতো জায়গা দান করুন।

অবশ্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য পূর্বে যোগবলের দ্বারা নারায়ণের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং বলিকে প্রার্থনা রক্ষা না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু বলি শোনেননি, বরং নিজের দানের মহিমা ধরে রাখার জন্য বামনরূপী নারায়ণের প্রার্থনা স্বীকার করেন। তখনই নারায়ণ বামনরূপ ত্যাগ করে বিশাল আকৃতি ধারণ করলেন। তিনি এক পা দ্বারা স্বর্গ এবং অন্য পা দ্বারা মর্ত্য দখল করেন। তারপর নারায়ণের নাভি থেকে নির্গত পা তিনি বলির মাথায় স্থাপন করেন এবং তাঁকে পাতালে আবদ্ধ করেন। দান করা ভালো কাজ কিন্তু শুক্রাচার্যের কথা না

শুনে অতিরিক্ত দানের কারণে বলি শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, প্রত্যেক কাজের মাত্রা থাকা উচিত। মাত্রাতিরিক্ত কোনো কাজ করলে সেটা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কারো জন্য মঙ্গলজনক হয় না।

সমাজ-বিশ্লেষণে সাহিত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য সম্ভবত সবচেয়ে বড় ইতিহাস। কারণ সাহিত্যে সমাজের সর্ব শ্রেণির অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, মজদুর থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চ শ্রেণির বক্তব্য পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্য শত শত বছর পূর্বে রচিত হলেও আজও গুরুত্ব কমেনি। *রামায়ণ, মহাভারত*সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্য আজও সমাদরে ঘরে ঘরে পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস’ (১৪০২: ৭)। তাই এসব সাহিত্যের সুবচন, চরিত্র, কাহিনি আজও আমরা বিভিন্ন আলোচনা, তর্কে টেনে নিয়ে আসি। আদর্শ মানবচরিত্র আলোচনায় রাম, যুধিষ্ঠিরের জুড়ি মেলা ভার। আদর্শ সমাজের আদর্শ বাবা-মা, ভাই-বোন, শাসক, সর্বোপরি আদর্শ মানুষ কেমন হতে পারে এসব আলোচনায় আমরা ফিরে যাই প্রাচীন সাহিত্যের কাছে। এসব সাহিত্যের সূক্তিগুলো সুন্দর সমাজ নির্মাণে যুগে যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রাচীন সাহিত্যের এ সুবচনগুলোর সাথে বর্তমান সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করলে মনে হয়, এগুলো বর্তমান সমাজেরই কথা। সম্ভবত সমাজের পরিবর্তন তেমন হয়নি। পার্থক্য শুধু শত শত বছরের।

সহায়কপঞ্জি

কালিদাস (২০১৬)। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* (সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

কৌটিল্য (২০১৪)। *কৌটিলীয়ম্* অর্থশাস্ত্রম্ (মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত ও সম্পাদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

চাণক্য (১৯৯০)। *চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্* (সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বাল্মীকি (১৯৯৬)। *রামায়ণম্* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী অনূদিত ও সম্পাদিত)। কলকাতা: নিউলাইট।

বিষ্ণুশর্মা (২০১৪)। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* খণ্ড ১৫ (প্রসূন বসু সম্পাদিত)। কলাকাতা: নবপত্র প্রকাশন।

বেদব্যাস (১৩৯৬)। *বামনপুরাণ* (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত)। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

বেদব্যাস (১৪২২)। *মহাভারতম্* (হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য অনূদিত ও সম্পাদিত)। কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী।

ভারবি (১৯৯২)। *কিরাতার্জুনীয়ম্* প্রথম সর্গ (কানাই লাল রায় সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ভারবি (১৯৯৪)। *কিরাতার্জুনীয়ম্* দ্বিতীয় সর্গ (ফয়েজুন্নেছা বেগম সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০২)। *প্রাচীন সাহিত্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

শূদ্রক (২০০৭)। *মৃচ্ছকটিকম্* (উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।